উপকারভোগী নারীদের কেঁচো সার তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

পরিকল্পনা ও প্রকাশনা

উইমেন্স এনভাইরনমেন্ট এন্ড ডেভলাপমেন্ট অর্গানাইজেশন (উইডু)

প্রকাশকাল: জুলাই ২০২০

কারিগরি সহায়তা

ইউএন উইমেন

আর্থিক সহায়তা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকাঃ ভার্মি কম্পোস্ট

উদ্ভিদ ও প্রানীজ বিভিন্ন প্রকার জৈব বস্তুকে কিছু বিশেষ প্রজাতির কেঁচোর সাহায্যে কম সময়ে জমিতে প্রয়োগের উপযোগী উন্নত মানের জৈব সারে রুপান্তর করাকে ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচো সার বলে। ভার্মি-কম্পোস্ট বা কেঁচোসার নিয়ে কাজ করেছে বহুদিন থেকেই বিভিন্ন গবেষনা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা। আবার অনেক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ব্র্যাক, কারিতাসসহ অনেক এনজিও ভার্মি-কম্পোস্ট তৈরিসহ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করে বাজারজাতও করছে। কিন্তু ভার্মি-কম্পোস্ট এখনো এদেশের কৃষকের কাছে সুপরিচিত নয়।

কোঁচোর ইতিহাস

কেঁচো কতদিন আগে পৃথিবীতে আর্বিভাব হয়েছিল, তার সঠিক তত্ত্ব নেই, কারণ কেঁচোর শরীর খুব নরম এবং সহজেই পচে যায়। তাই জীবাশ্ব সৃষ্টি হওয়া কঠিন। এর বিবর্তনীয় অবস্থান পতঙ্গের নীচে। কেঁচোর আর্বিভাব সম্পর্কে দুটি উল্লেখযোগ্য ধারণা বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ সমাদৃত। বিজ্ঞানী জে. স্টিফেনসনের (১৯৩০) মতে “কেঁচো আজ থেকে প্রায় ১২ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে আর্বিভাব হয়েছিল”। অর্থাৎ দ্বিবীজপত্র গাছ (dicotyledonous) আর্বিভাব হওয়ার পরে। অন্য একদল বিজ্ঞানী আরো পূর্বে (প্রায় ৫৭ কোটি বছর) আবির্ভাবের কথা বলেন।

কেঁচোর প্রজাতি

সারা বিশ্বে ৪,২০০-এর বেশি প্রজাতির কেঁচো আছে। তার মধ্যে আমাদের দেশে ৫০০-র কিছু বেশি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। যেসব স্থানে দেখা যায় না, তা হল-সমুদ্র, মরুভুমি, সর্বদা বরফাবৃত স্থান এবং যেখানে কোন রকম গাছপালা নেই। অবস্থান অনুসারে কেঁচোকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১) পেরিগ্রাইন (Perigrine): যারা সব রকম পরিবেশ মানিয়ে নিতে পারে এবং সর্বত্র বিরাজ করে।

২) এনডেমিক (Endemic): যারা কিছু নির্দিষ্ট স্থানে বর্তমান। এরা সব রকম পরিবেশ মানিয়ে নিতে পারে না।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ চারটি প্রজাতির কেঁচো, সার তৈরীর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন-(১) আইসেনিয়া, (২) ইউড্রিলাস, (৩) ফেরেটিমা এবং (৪) পেরিওনিক্স। আইসেনিয়া ফিটিডা (Eisenia foetida) নামক কেঁচোটি মূলতঃ এসেছে জার্মানি থেকে। সম্ভবত সারা বিশ্বে এই প্রজাতির কেঁচোটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে সর্বত্র এটি পাওয়া যায়। বিভিন্ন তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় বেঁচে থাকতে পারে। এরা দ্রুত বাড়ে। গড় আয়ু ৭০ দিন। অতি সহজেই এই প্রজাতির কেঁচো উৎপাদন করা যায়। কিছু প্রজাতির কেঁচো আছে, যারা মাটির উপরের স্তরে (২০-৩০ সেমি) থাকতে ভালবাসে, তাদের এপিগি (epige) বলে। মাটির গভীরে (৩০ সেমি) থাকে, তাদের এন্ডোগি (endoge) বলে। মাটির উপরের দিকে বসবাসকারী কেঁচো সার তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। ইউড্রিলাস ইউজেনি (Eudrilus Eugenie) প্রজাতির কেঁচোর আবির্ভাব ঘটেছে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে। দক্ষিণ ভারতের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে এদের পাওয়া যায়। গায়ের রং তামাটে, লাল ও গাঢ় বেগুনী রঙের হয়। এই কেঁচোও দ্রুত বাড়ে এবং সার তৈরীর ক্ষেত্রে উপযোগী। কেঁচোর গড় দৈর্ঘ্য ৩২-১৪০ মিমি, ব্যাস ৫-৮ মিমি, শরীর ১৪৫-১৯৬টি খন্ডে বিভক্ত। গড়ে প্রতিদিন ১২ গ্রাম জৈব বস্তু গ্রহন করে। প্রায় ৪০ দিনে পূর্নতা লাভ এবং পুর্ণতায় আসার সাতদিন পর প্রতিদিন ১টি করে ডিম থেকে ১৬-১৭ দিন পর বাচ্চা কেঁচো (১-৩ টি) জন্ম নেয়। ঠান্ডা ও গরম সহ্য করতে পারে এবং প্রায় ১-৩ বছর বাঁচে।

পেরিওনি এ কাভেটাস (Preionyx excavatus) কেঁচোর আদি নিবাস হল অস্ট্রেলিয়া। এই কেঁচোর পিঠের উপর সামনের অংশের রং ঘন বেগুনী থেকে লালচে-বাদামী এবং নীচের অংশ হালকা রঙের হয়। দৈর্ঘ্য ২৩-

১২০ মিমিঃ ব্যাস ২.৫ মিমিঃ। অধিক আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে। পচা পাতা, কাঠ এবং বহমান নদীতেও পাওয়া যায়। জীবনকাল গড় ৪৬ দিন। পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ২১-২২ দিনে এবং গুটি বা ডিম দিতে থাকে ২৪ দিন পর, প্রতিদিন ১ টি করে। গুটি প্রতি ১-৩ টি কেঁচো যাওয়া যায়। আমাদের দেশের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্মিকম্পোষ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা চলছে এবং উন্নত মানের ভার্মিকম্পোট তৈরী করতে ইউড্রিলাস ইউজেনি এবং আইসেনিয়া ফিটিডা-কে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়। পশ্চিমা দেশ গুলিতে আবার ইউড্রিলাস ফিটিডার ব্যবহার বেশি। ইউড্রিলাস ইউজেনি কেঁচোর সহনশীলতা বেশি। বিভিন্ন জৈব কীটনাশক যেমন-নিম খোল, মহুয়া খোল, গ্লাইরিসিডিয়া, ইউপাটোরিয়াম ইত্যাদির প্রতি অনেক বেশি সহনশীলতা দেখায়।

কেঁচোর গুরুত্ব

বিজ্ঞানী চালর্স ডারউইন সর্বপ্রথম কেঁচোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সকলকে অবগত করান। তিনি বলেন "কেঁচো ভুমির অন্ত্র এবং পৃথিবীর বুকে উর্বর মাটি তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রধান ভুমিকা পালন করে, যার উপর আমরা আমাদের ফসল উৎপাদন করি"। এই অতি সাধারন, ক্ষুদ্র প্রানীটি পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে সোনা ফলাতে পারে, কেঁচোসার বা ভার্মিকম্পোস্টে রুপান্তরিত করে। কেঁচোর উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ গুলি হল-মাটির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে খনন, চলন, আহার এবং পাচ্য পদার্থ মল রুপে নিষ্কাশন। এইসব কার্যকলাপ নির্ভর করে মাটির অম্লতা (pH), জৈব পদার্থের পরিমান, পানি, তাপমাত্রা ইত্যাদির উপর। ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির (species) কেঁচোর কার্যকলাপ বিভিন্ন। সুতরাং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সব ধরণের কেঁচো একই রকম ভূমিকা পালন করে না। খনন ও চলন ক্রিয়ার মাধ্যমে মাটি কর্ষণ করতে পারে, অপর

দিকে কেঁচো ৩ মিটার পর্যন্ত কর্ষণ করে, গাছ পালার কোনরকম ক্ষতি সাধন না করে। ফলে মাটিতে ছিদ্রের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, মাটির গহবরে পানি প্রবেশ করতে সাহায্য করে। মাটির তলায় (subsoil) পানির মাত্রা বৃদ্ধি পায়, মাটির ভিতরে তাপমাত্রার স্থিতিশীলতা এবং বায়ু চলাচল বৃদ্ধি পায়। কেঁচো, মাটি ও জৈব পদার্থ খেয়ে থাকে। আহার প্রক্রিয়া চলাকালীন অনবরত শরীরকে আর্দ্র রাখে। ফলে সর্বদা অতি সামান্য মাত্রায় হলেও মাটির আর্দ্রতা বাড়ায়। সেই সাথে ইউরিয়ার (urea) পরিমান বৃদ্ধি পায়। কেঁচো তার পোষ্টিক তন্ত্রের সাহায্যে মাটির কনাকে ভেঙ্গে দেয় এবং মাটির ভেতরে অবস্থিত গাছের খাদ্য উৎপাদন গুলিকে সহজ লভ্য করে তোলে। মাটি কণা ছোট হওয়ার ফলে আয়তন বেড়ে যায় মাটির পানিধারণ ক্ষমতা ও বায়ু চলন মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কেঁচোর উপস্থিতিতে মাটিতে বায়ু চলাচল ক্ষমতা ৮-৬৭% বৃদ্ধি পেতে পারে।

আহার পর্বের পর যে পাচ্য পদার্থ মলরুপে নির্গমণ হয় তাকে কাস্ট (cast) বলে। এই কাস্টের ভিতর জীবাণু সংখ্যা এবং তার কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে মাটির উর্বরতা বাড়ে। দেখা গেছে, পারিপার্শ্বিক মাটির তুলনায় কাস্টের মধ্যে জীবাণু সংখ্যা প্রায় হাজার গুণ বেশি। এই কাস্টের উপরে বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক উৎপাদনকারী ব্যাক্টেরিয়া জীবাণু বেশি থাকায় মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। যেমনঃ কাস্টের কারণে মাটি থেকে গাছে ৬ শতাংশ নাইট্রোজেন এবং ১৫-৩০ শতাংশ ফসফরাস হতে দেখা গেছে। এছাড়াও অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্য উপাদান যেমনঃ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি, গাছে বেশি পরিমাণে উপলব্ধ হয়। কেঁচোর উপস্থিতিতে জৈব পদার্থের কার্বন ও নাইট্রোজেন অনুপাত (C:N ratio) প্রায় ২০:১ এর কাছাকাছি হয়। এই অনুপাতে গাছ সহজেই কম্পোস্ট থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

ভার্মিকম্পোস্ট প্রস্তুত প্রণালী

কেঁচোর বৈশিষ্ট্য

কেঁচোর সার তৈরি করতে নির্দিষ্ট প্রজাতির কেঁচো বেছে নেওয়ার জন্য তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে নেওয়া আবশ্যক। যেমনঃ

১) শীত ও গ্রীষ্ম উভয় আবহাওয়াতে বেঁচে থাকার ক্ষমতা।

২) সব রকম জৈব বস্তু থেকে খাবার গ্রহণ করার সামর্থ্য।

৩) কেঁচো যেন রাক্ষুসে প্রকৃতির হয়, অর্থাৎ প্রচুর আহার করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

৪) অন্যান্য প্রজাতির কেঁচোর সাথে মিলেমিশে বাস করা।

৫) জৈব দ্রব্য পাওয়ার সাথে সাথে বা অল্প সময়ের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠা এবং সেখান থেকে খাবার সংগ্রহ করা।

৬) রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এবং প্রতিকুল অবস্থানে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়া।

৭) দ্রুততার সাথে বংশ বিস্তার করা এবং শারীরিক বৃদ্ধি ঘটানো।

উপকরণ

যে সব দ্রব্যকে কেঁচো সারে পরিণত করা যায় তা হলঃ (১) প্রাণীর মল-গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, ছাগল-ভেড়ার মল ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে গোবর উৎকৃষ্ট; মুরগীর বিষ্ঠায় প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ফসফেট থাকে যা পরিমাণে বেশি হলে কেঁচোর ক্ষতি হতে পারে। তাই খড়, মাটি বা গোবরের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা ভাল। (২) কৃষিক বর্জ্য-ফসল কাটার পর পড়ে থাকা ফসলের দেহাংশ যেমন-ধান ও গমের খড়, মুগ, কলাই, সরষেও গমের খোসা, তুষ, কান্ড, ভুষি, সব্জির খোসা, লতাপাতা, আখের ছোবড়ে ইত্যাদি। (৩) গোবর গ্যাসের পড়ে থাকা তলানি বা স্লারী (Slurry)। (৪) শহরের আবর্জনা এবং (৫) শিল্পজাত বর্জ্য যেমনঃ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা বর্জ্য। যে সব বস্তু ব্যবহার করা উচিত নয়, তা হলঃ পেঁয়াজের খোসা, শুকনো পাতা, লংকা, মসলা এবং অম্ল সৃষ্টিকারী

বর্জ্য যেমনঃ টমেটো, তেঁতুল, লেবু , কাঁচা বা রান্না করা মাছ মাংসের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি। এছাড়া অজৈব পদার্থ যেমনঃ পাথর, ইটের টুকরা, বালি, পলিথিন ইত্যাদি।

স্থান নির্বাচন

সার তৈরী করতে প্রথমে ছায়াযুক্ত উঁচু জায়গা বাছতে হবে, যেখানে সরাসরি সূর্যালোক পড়বে না এবং বাতাস চলাচল করে। উপরে একটি ছাউনি দিতে হবে। মাটির পাত্র, কাঠের বাক্র, সিমেন্টের পাত্র, পাকা চৌবাচ্চা বা মাটির উপরের কেঁচো সার প্রস্তুত করা যায়। লম্বা ও চওড়ায় যাই হোকনা কেন উচ্চতা ১-১.৫ ফুট হতে হবে। পাত্রের তলদেশে ছিদ্র থাকতে হবে যাতে কোনভাবেই পাত্রের মধ্যে জল না জমে। একটি ৫´ ৬” ও ৩´ ২” চৌবাচ্চা তৈরী করে নিতে পারলে ভাল হয়।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে চৌবাচ্চা বা পাত্রের তলদেশে ৩ ইঞ্চি বা ৭.৫ সেমি ইঁটের টুকরা, পাথরের কুচি ইত্যাদি দিতে হবে। তার উপরে ১ ইঞ্চি বালির আস্তরণ দেওয়া হয় যাতে পানি জমতে না পারে। বালির উপর গোটা খড় বা সহজে পচবে এরকম জৈব বস্তু বিছিয়ে বিছানার মত তৈরি করতে হয়। এর পর আংশিক পঁচা জৈব দ্রব্য (খাবার) ছায়াতে ছড়িয়ে ঠান্ডা করে বিছানার উপর বিছিয়ে দিতে হবে। খাবারে পানির পরিমাণ কম থাকলে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে যেন ৫০-৬০ শতাংশ পানি থাকে। খাবারের উপরে প্রাপ্ত বয়স্ক কেঁচো গড়ে কেজি প্রতি ১০ টি করে ছেড়ে দিতে হবে। কেঁচোগুলি অল্প কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর এক মিনিটের মধ্যেই খাবারের ভেতরে চলে যাবে। এরপর ভেজা চটের বস্তা দিয়ে জৈব দ্রব্য পুরাপুরি ঢেকে দেওয়া উচিত। বস্তার পরিবর্তে নারকেল পাতা ইত্যাদি দিয়েও ঢাকা যেতে পারে। মাঝে মাঝে হালকা পানির ছিটা দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে অতিরিক্ত পানি যেন না দেওয়া হয়। এভাবে ২ মাস

রেখে দেওয়ার পর (কম্পোস্ট) সার তৈরি হয়ে যাবে। জৈব বস্তুর উপরের স্তরে কালচে বাদামী রঙের, চায়ের মত দানা ছড়িয়ে থাকতে দেখলে ধরে নেওয়া হয় সার তৈরি হয়ে গেছে। এই সময়ে কোন রকম দুর্গন্ধ থাকে না।

কম্পোস্ট তৈরি করার পাত্রে খাবার দেওয়ার আগে জৈব বস্তু, গোবর, মাটি ও খামারজাত সার (FYM) নির্দিষ্ট অনুপাত (৬ : ৩ : ০.৫ : ০.৫) অর্থাৎ জৈব আবর্জনা ৬ ভাগ, কাঁচা গোবর ৩ ভাগ, মাটি ১/২ ভাগ এবং খামার জাত সার (FYM) ১/২ ভাগ, মিশিয়ে আংশিক পচনের জন্য স্তুপাকারে ১৫-২০ দিন রেখে দিতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর ঐ মিশ্রিত পদার্থকে কেঁচোর খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে, একটি ১ মিটার লম্বা, ১ মিটার চওড়া ও ৩ সেমি গভীর আয়তনের গর্তের জন্য ৪০ কিলোগ্রাম খাবারের প্রয়োজন হয়। এরকম একটি গর্তে এক হাজার কেঁচো প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথম দিকে কম্পোস্ট হতে সময় বেশি লাগে (৬০-৭০ দিন)। পরে মাত্র ৪০ দিনেই সম্পন্ন হয়। কারণ ব্যাক্টেরিয়া ও কেঁচো উভয়েরই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। তথ্য অনুসারে ১ কেজি বা ১০০০ টি কেঁচো, ৬০-৭০ দিনে ১০ কেজি কাস্ট তৈরি করতে পারে। এক কিলোগ্রাম কেঁচো দিনে খাবার হিসাবে ৫ কিলোগ্রাম সবুজসার (& Green leaf manure) খেতে পারে। তার জন্য ৪০-৫০ শতাংশ আর্দ্রতার বজায় রাখা আবশ্যক। প্রায় ৮০০-১০০০ কেঁচোর ওজন হয় ১ কিলোগ্রাম। এই পরিমাণ কেঁচো সপ্তাহে ২০০০-৫০০০ টি ডিম বা গুটি (Cocoon) দেয়। পূর্ণাঙ্গ কেঁচোর জন্ম হয় ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে।

সমস্যা ও সমাধান

কেঁচো সার তৈরি করতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা নিম্নে দেওয়া হলঃ

সমস্যা কারণ সমাধান

দুর্গন্ধ ও মাছি এবং পোকার আবির্ভাব ক) বিছানা অতিরিক্ত ভেজা।

খ) কেঁচোর খাবার সরাসরি বায়ুমন্ডের সংস্পর্শে আসা।

গ) তৈলাক্ত বা অপছন্দের খাবার।

ঘ) পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল না করা।

ঙ) অতিরিক্ত খাবার দেওয়া। ক) বিছানা থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, বিছানাকে কিছু দিয়ে আলগা করা।

খ) খাবার ঢেকে দেওয়া ।

গ) অপ্রয়োজনীয় খাবার সরিয়ে দেওয়া।

ঘ) কিছু দিন খাবার দেওয়া বন্ধ রাখা।

কেঁচো মরে যাওয়া ক) অত্যাধিক শুকনো বা ভেজা খাবারের অভাব।

খ) বিছানার আস্তরণ শেষ হয়ে যাওয়া।

গ) বেশি ঠান্ডা বা গরম।

ঘ) বিষাক্ততা। ক) সহনশীল স্থানে কম্পোস্টের জায়গা বদল করা।

খ) খাবার ও বিছানার বস্তুগুলি ভালভাবে দেখে নেওয়া যেন ক্ষতিকারক কোন বস্তু না থাকে।

ছত্রাক ক) অম্লতা সৃষ্টি। ক) লেবুর খোসা, তেঁতুল ইত্যাদি অম্লতা সৃষ্টিকারী বস্তু সরিয়ে ফেলা।

নীচ দিয়ে পানি গড়িয়ে যাওয়া ক) অতিরিক্ত পানি ব্যবহার। ক) অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়া। বিছানা করার জৈব বস্তু মিশিয়ে দেওয়া, দু-এক দিন উপরের ঢাকনা সরিয়ে রাখা।

কেঁচো পালিয়ে যাওয়া ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। ক) উপরের কারণগুলি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা ও প্রতিকার নেওয়া।

কোঁচো সার উৎপাদনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব

কেঁচোসার উৎপাদন ও বিক্রয়ের একটি আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হলঃ

ব্যয়

বিষয়/বস্তু পরিমাণ মূল্যহার মোট মূল্য

প্রথম বছর ১)
চৌবাচ্চ নির্মাণ (৫´ x ৩´
x ১.৫´) ৪
২০০০.০০
৮০০০.০০ ২)
ছাউনী ১ ১০০০.০০
১০০০.০০ ৩)
কেঁচো সংগ্রহ ৪০০
২৫০.০০/হাজার
১০০০.০০
৪) গোবর ও আবর্জনা সংগ্রহ ৮ টন ৫০০.০০/টন ৪০০০.০০
মোট ১৪০০০.০০
দ্বিতীয় বছর
১) গোবর ও আবর্জনা সংগ্রহ ১২ টন ৫০০.০০/টন ৬০০০.০০
মোট ৬০০০.০০

ভার্মি কম্পোস্টকে মাটির প্রাণ বলা হয়। এই মাটির প্রাণ তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছেন পবা উপজেলার বড়গাছি ইউনিয়ন পরিষদের মাধবপুর গ্রামের নারীরা। কিভাবে এবং কেন ভার্মি কম্পোস্ট তৈরিতে উৎসাহিত হলেন জানতে চাইলে পূর্বাশা নারী সংগঠনের সভাপতি মোসাঃ মনিরা বেগম বলেন, “আমি একদিন বড়গাছি ইউনিয়ন পরিষদের এক সভাতে গেছিলাম সেখানে জানতে পারি কেঁচো কম্পোস্ট বা ভার্মি কম্পোস্ট এর ব্যবহার ও উপকারিতার কথা। জানতে পেরেছিলাম কোথায় কেঁচ কম্পোস্ট তৈরি হয়।” কেঁচো কম্পোস্ট সম্পর্কে ধারণা লাভ

কেচোঁ মানুষের একটি অন্যতম উপকারী প্রাকৃতিক ক্ষুদ্র প্রাণী। এ প্রাণী যে মাটি চাষাবাদের কাজে উপকারে আসে তা আমরা গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করিনি। প্রধানত কেচোঁ উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে তুলে থাকে। এসব কাজের সাথেই কেচোঁর সারও তৈরি হয়। কেচোঁর দ্বারা জৈব সার তৈরির জন্য এ সাথে তরকারির খোসা, গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ও নাড়িভুড়ি, পাতাসহ পচা আবর্জনারও প্রয়োজন হয়।

কেচোঁ কম্পোস্ট তৈরি করতে হলে প্রথমে গর্ত তৈরি করতে হয়। এরপর এসব গর্তে ঘাস, আমের পাতা বা খামারের ফেলে দেয়া অংশ এসবের যেকোনো একটি ছোট ছোট করে কেটে এর প্রায় ২৫ কেজি হিসেবে নিতে হয়।

তবে বসেব আবর্জনা গর্তে ফেলার আগে গর্তেও তলদেশসহ চারপাশে পলিথিন দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। এতে করে গর্তের কেচোঁ পিট থেকে বাইরে যেতে পারবে না।

কেচোঁ কম্পোস্ট তৈরির জন্য প্রথমেই পলিথিন বিছানোর পরে গর্তের নিচে ১৫ সে. মিটার পুরু করে বেড বানাতে হবে। এ বেড তৈরির জন্য ভাল মাটি ও গোবর সমপরিমাণে মিশাতে হবে এবং এসব মিশানো

গোবর ও মাটি পরে কেচোঁর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত এসব কম্পোস্ট তৈরির কাজে দুই ধরনের কেচোঁর জাত রয়েছে। তাহলো-এপিজিক ও এন্ডোজিক নামের। এপিজিক জাতগুলো দেখতে লাল রংঙের এরা মাটির উপরের স্তরেই বিচরণ করে থাকে। এরা সাধারণত সার উৎপাদন করতে পারে না তবে এরা মাটির ভৌত ও জৈব গুণাবলির উন্নতি করে।
কেচোঁ কম্পোস্ট তৈরির জন্য এসব গর্ত গোবর ও মাটি দিয়ে ভর্তি করার পর এতে প্রায় ২ হাজার কেচোঁ প্রয়োগ করতে হয়। কেচোঁ প্রয়োগের পর গর্তের উপরিভাগ পাটের ভিজানো চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং সারের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য গর্তেও উপরিভাগে ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা খুবই জরুরি।

এসব কেচোঁ যেসব খাবার খায় তা গর্তে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করতে হবে। কেচোঁর খাবারের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় ঘাস, খামারজাত পদার্থ, আখের ও কলার ফেলে দেয়া অংশ এসব। এয়াড়া এসব অংশ মাটিতে পচে জৈব সারও তৈরি হয়।

অন্যান্য কম্পোস্ট তৈরির চেয়ে কেচোঁ কম্পোস্ট তৈরি করতে সময় কম লাগে। এছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে একটি আদর্শ ভার্মিকম্পোস্ট ১.৫৭% নাইট্রোজেন, ১.২৬% ফসফরাস, ২.৬০% পটাশ, ০.৭৪% সালফার, ০.৬৬% ম্যাগনেশিয়াম, ০.০৬% বোরণ রয়েছে। এছাড়া কেচোঁ কম্পোস্টে অন্যান্য কম্পোস্টের চেয়ে প্রায় ৭-১০ ভাগ পুষ্টিমান বেশি থাকে।

সাধারণত পিপঁড়া, উইপোকা, তেলেপোকা, মুরগী, ইঁদুর পানি এসব কেচোঁর বড় শত্রু। এরা যেন কেচোঁর কাছে আসতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে

হবে।

কেচোঁ কম্পোস্টের উপাদান

উপাদান	শতকরা হার
নাইট্রোজেন	১.০
ফসফেট	১.০
পটাশিয়াম	১.০
জৈব কার্বন	১৮.০
পানি	১৫-২৫

পর্ব-৭। বর্তমানে প্রেক্ষাপটে এ দেশের সরকার সারের উপর বিশাল অংকের ভর্তুকি দেওয়ার পরও ইউরিয়া - ১২ টাকা, এম . পি -২৪ টাকা ও টি. এস . পি -২৬ টাকা কেজি দরে বিক্রয় হচ্ছে। আবার অনেক সময় অতি উচ্চ মূল্য দিয়েও সময়মত ও পরিমান মতো সার কৃষকের হাতে পৌঁছায় না। এ জন্য আমরা যাদ ভার্মি - কম্পোস্ট বা কেঁচো সার কৃষকদের / যুবকদের সচেতনতার মাধ্যমে তৈরি করতে পারি , তাহলে রাসায়নিক সারের উপর চাপ অনেকখানি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। সাথে সাথে উৎপাদনকারীর আয়ের পথ খুজে পাবে , যাতে করে সে স্বনির্ভর হতে পারে । ভার্মিকম্পোস্টের ব্যবহার- ভার্মিকম্পোস্ট সব প্রকার ফসলে যে কোন সময়ে (any stage of the crop growth) ব্যবহার করা যায়। সবজি এবং কৃষি জমিতে ৩ -৪ টন প্রতিহেক্টরে ও ফল গাছে গাছ প্রতি ৫-১০ কিলোগ্রাম হারে ব্যবহার করা হয়। ফুল বাগানের ক্ষেত্রে ব্যবহারের পরিমাণ আরো বেশি ৫-৭ . ৫ কুইন্টাল এক হেক্টর জমিতে। জমির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা বজায় রাখার জন্য জৈব সার ব্যবহারের প্রবণতা ক্রমশঃ বাড়ছে। এদেশের মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন এ ব্যাপারে। তাই ভার্মি- কম্পোস্ট উৎপাদন ও তার ব্যবহার এক মূলবান ভুমিকা পালন করতে চলেছে আগামী দিনগুলি। ।

রাজশাহীর দুর্গাপুরে বর্তমান সরকারের আমলে কৃষিখাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও সরকারি ভাবে কৃষকদের প্রণোদনা দেয়ায় এ উপজেলার কৃষিখাতে এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। অব্যাহত ভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে ফসলের জমি ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে তার প্রাকৃতিক শক্তি।

এতে করে যেমন ফসল ফলাতে গিয়ে কৃষকদের বাড়তি রাসায়নিক সারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তেমনি দিনের পর দিন বাড়ছে খরচ। এই অবস্থায় জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা বিকল্প উপায় খুঁজতে গিয়ে ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদনের চিন্তা করেন। এরপর থেকেই উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে যুবকদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তাদের ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদনের কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত করেন। ফলে একদিকে যেমন কৃষিতে জৈব সারের ব্যবহার বেড়েছে। তেমনি কৃষকরা আর্থিক ভাবেও লাভবান হচ্ছেন।

জানা গেছে, রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জমিতে কম্পোস্ট সার এবং কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোস্ট এখন দিন দিন জনপ্রিয়ও হয়ে উঠছে। এর প্রস্তুত প্রণালী অনেকটা সহজ হলেও কেঁচো সংগ্রহ এবং সার উৎপদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে কৃষকদের এখনো তেমন ধারণা নাই। তবে আশার কথা হলো, এই কেঁচো সার উৎপাদন করেই আশার আলো দেখছেন রাজশাহীর দুর্গাপুরের বহরমপুর গ্রামের কয়েকজন কৃষক। প্রায় ১৫ বছর আগে গড়ে তোলা তাঁদের কৃষি ভিত্তিক একটি ক্লাবের মাধ্যমেই স¤প্রতি কেঁচো সারের উৎপাদন শুরু করেন তারা। বহরমপুর আইপিএম ক্লাবের ৩২ সদস্য মিলে এ সার উৎপাদন করে এরই মধ্যে এলাকায় বেশ সাড়া ফেলেছেন তারা।

দুর্গাপুর উপজেলা কৃষি অধিদফতর সূত্র মতে, উর্বর মাটিতে পাঁচ ভাগ জৈব পদার্থ থাকতে হয়। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও বায়ু চলাচল বাড়াতে

ওই পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকতে হলেও আমাদের দেশের মাটিতে রয়েছে ১ দশিমক ৮০ থেকে ২ ভাগ। কোন অঞ্চলে আরও কম। এতে করে জমিতে চাষীরা পর্যাপ্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহারে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ফলে বিভিন্ন ফসলের উপর রোগ ও পোকামাকড়লের আক্রমণ বৃদ্ধিসহ ফসলের ফলন কমে যাচ্ছে। সেহেতু জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়াতে ভার্মি কম্পোস্ট এর ভূমিকা অপরিসীম। এটি বিবেচনা করে দুর্গাপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা অফিসার ড. বিমল কুমার প্রামানিকের পরামর্শে এবং উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোখলেছুর রহমানের সহযোগিতায় ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির কাজ হাতে দেন বহরমপুর আইপিএম ক্লাবের সদস্যরা। এটি করতে প্রথমে কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠনগুলোকে একত্রিত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরির কাজ শুরু করেন বহরমপুর আইপিএম ক্লাবের সদস্যরা। যার নাম দেওয়া হয় ‘সয়েল হেলথ ভার্মি কম্পোস্ট ফার্ম’।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, বহরমপুর গ্রামের একটি আম বাগানের পাশে এই ফার্মটি তৈরি করা হয়। উপরে টিনের ছাউনি আর নিচে বেড়া দিয়ে দিয়ে তৈরী করা একটি ঘরের মধ্যে পাশাপাশি চারটি লাইনে ২৫০ টি মাটির চাড়ি বসানো হয়েছে। প্রতি মাটির চাড়িতে ১৫ কেজি গোবর সার ও ২০০ গ্রাম করে অস্ট্রেলিয়া জাতের কেঁচো দেওয়া আছে। কেঁচো গুলো গবর খেয়ে ফেলে। এরপর তারা যে মল পরিত্যাগ করে, সেগুলোই পরের ১৫ দিনের মধ্যে ভার্মি কম্পোস্ট সারে পরিণত হয়।

জানতে চাইলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোখলেছুর রহমান বলেন, ভার্মি কম্পোস্ট সার প্রতি শতক জমিতে পাঁচ কেজি হারে প্রয়োগ করলে রাসায়নিক সার শতকরা ৫০ ভাগ প্রয়োগ করতে হবে। আর পরপর তিন বছর একই জমিতে বিভিন্ন ফসলে ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহার করার ফলে বাসায়নিক সারের ব্যবহার আর প্রয়োজন হবে না। তখন শুধু ভার্মি কম্পোস্ট সার দিয়েই ফসল ফলানো সম্ভব হবে।

ওই ক্লাবের সভাপতি মাইনুল ইসলাম জানান, বর্তমান সরকারের কৃষিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে উপজেলা কৃষি বিভাগ থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে তারা প্রথমে অস্ট্রেলিয়া জাতের ১৬ কেজি কেঁচো কিনে এনে এ সার উৎপাদন শুরু করেন। প্রতি কেজি কেঁচো ১ হাজার টাকা করে তারা কিনে আনেন। তবে বর্তমানে তাঁদের ফার্মে প্রায় ৫০ কেজি কেঁচো উৎপাদন হয়েছে। কারণ যে কেঁচো মাটির চাড়িতে রাখা হয়, সেগুলো আবার বাচ্চা দেয়। এরপর যখন সারে পরিণত হয়, সেগুলো ছাকনা দিয়ে চেলে নিয়ে কেঁচোগুলোকে আলাদা করে নেওয়া হয়। আর সারগুলো হয়ে যায় আলাদা। এরপর সেই কেঁচোগুলো আবারো চাড়িতে ছেড়ে দেওয়া হয় গবরের মধ্যে। এভাবেই কেঁচো থেকে কেঁচো উৎপাদনের পাশাপাশি সারও উৎপাদন হচ্ছে। এতে করে দুইদিক থেকেই লাভ হচ্ছে তাদের।

মাইনুল ইসলাম আরো বলেন, এই সার ক্লাবের সব সদস্যরা তাদের বিভিন্ন ফসলে এরই মধ্যে ব্যবহার শুরু করেছেন। পাশাপাশি গ্রামের অন্য কৃষকরাও কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে সারের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে রাসায়নিক সার ব্যবহারও কমিয়ে দিয়েছেন। আশা করা যায় আগামী ৫ বছরের মধ্যে উপজেলার অন্তত ৭৫ ভাগ কৃষক ভার্মি কম্পোস্ট সার ব্যবহার করতে শিখবে। আর এটি শুরু হলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমের দিক থেকে দুর্গাপুরই হবে দেশের একটি মডেল উপজেলা। সেই সঙ্গে পরিবেশ দূষনমুক্ত হবে এবং প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার রাসায়নিক সার কেনা থেকে কৃষকরা রেহায় পাবেন।

দুর্গাপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসরাণ কর্মকর্তা ড. বিমল কুমার প্রামানিক বলেন, বর্তমান সরকারের কৃষি খাতে উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা কৃষি বিভাগ থেকে বেকার যুকব ও এলাকার কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিই। বর্তমানে ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরি ও বিক্রি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে দুর্গাপুরে। এটি তৈরি করেই বছরে লাখ লাখ টাকা আয় করতে পারবেন কৃষকরা। আবার ফসলে রাসায়নিক সারের ব্যবহারও কমে যাবে

কয়েকগুণ। এক সময় হয়তো এ উপজেলায় আর রাসায়নিক সারের প্রয়োজনই হবে না। যদি কৃষকদের মাঝে এটি সঠিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দুর্গাপুরে শুধু ভার্মি কম্পোস্ট সার ব্যবহার করেই সব ধরনের ফসল আমরা উৎপাদন করতে পারবো বলে আশা করছি।

পঞ্চগড় : জেলায় খাদ্য নিরাপত্তায় সুশাসন প্রকল্পের মাধ্যমে তিনটি ইউনিয়নে কম খরচে কেঁচো সার তৈরি হচ্ছে। কম খরচ হওয়ায় এ সারের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে মধ্যে প্রায় ৭০ টি পরিবারের মধ্যে কেঁচো সার তৈরীর জন্য রিং ও কেঁচো সরবরাহ করেছে আরডিআরএস বাংলাদেশ।

কৃষি বিশেষজ্ঞের মতে, এ সার জমিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের সঠিক মাত্রায় সরবরাহের মাধ্যমে জমির উর্বরতা শক্তি এবং মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মাটির নাইট্রোজেন যোগ করে মাটির অম্ল-ক্ষার ভারসাম্য ঠিক রাখে।

ফসলের শিকড় বৃদ্ধি ও বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কম খরচে কেঁচো সার ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্যরক্ষা হয়।

সাধারণত রিং/চারির মধ্যে ১৫/২০ দিনের পঁচা গোবর রি/চারির মধ্যে দিয়ে এপিজিয়েট জাতের কেঁচো ছেড়ে দিলে ২০/২৫ দিনের খাবার ক্ষেয়ে সার তৈরী করে ফেলে। এটি সাধারণত চা এর দানার মতো যখন তৈরী হয়। এবং গোবরের কোন গন্ধ থাকে না তখন বুঝতে হবে সার তৈরি হয়েছে। তখন তা চালুনি দিয়ে চেলে সার সংগ্রহ করা যায়।

জেলার কেঁচো সার তৈরি হচ্ছে তিনটি ইউনিয়নে। তা হলো- ধাক্কামারা, হাফিজাবাদ ও হাড়িভাসা। ধাক্কামারা ইউনিয়নের নুরজাহান বেগম বলেন, এই সার দিয়ে সবজি চাষ করে খুব ভাল সবজি হয়েছে। সবজি চাষে তেমন কোন রোগের আক্রমণ হয় না।

১হাড়িভাসার ইউনিয়নের আবুল কাশেম আলীজানান, তিনি কেঁচো সার ব্যবহার করে টমেটো চাষ করেন এবং টমেটোর ফলন ভাল হয়েছে। তার টমেটো ক্ষেতে গোরা পঁচা রোগ হয়নি।

আরডিআরএস বাংলাদশ খাদ্য নিরাপত্তায় সুশাসন প্রকল্পের কৃষি কর্মকর্তা ফিরোজ বুলবুল বলেন, আমরা কম খরচে এ সার ব্যকৃষকদের বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি। পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তারাও বিভিন্ন সময় আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক:
অব্যাহতভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে ফসলের জমি ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে তার প্রকৃতিক শক্তি। এতে করে যেমন ফসল ফলাতে গিয়ে কৃষকদের বাড়তি রাসায়নিক সারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে,

তেমনি দিনের পর দিন বাড়ছে খরচ। এই অবস্থায় জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে কৃষি বিভাগ নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জমিতে কম্পস্ট সার এবং কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোস্ট এখন দিন দিন জনপ্রিয়ও হয়ে উঠছে। তবে ভার্মি সার উৎপাদন এখনো ততটা সহজলোভ্য হয়ে উঠেনি সারাদেশে। এর প্রস্তুত প্রণালী অনেকটা সহজ হলেও কেঁচো সংগ্রহ এবং সার উৎপদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে কৃষকদের এখনো তেমন ধারণা নাই। তবে আসার কথা হলো, এই কেঁচো সার উৎপাদন করেই আসার আলো দেখছেন রাজশাহীর দুর্গাপুরের বহরমপুর গ্রামের কয়েকজন কৃষক।

প্রায় ১৫ বছর আগে গড়ে তোলা তাঁদের কৃষিভিত্তিক একটি ক্লাবের মাধ্যমেই সম্প্রতি কেঁচো সারের উৎপাদন শুরু করেন তারা। বহরমপুর আইপিএম ক্লাবের ৩২ সদস্য মিলে এ সার উৎপাদন করে এরই মধ্যে এলাকায় বেশ সাড়া ফেলেছেন তারা।

দুর্গাপুর উপজেলা কৃষি অধিদপ্তর সূত্র মতে, উর্বর মাটিতে পাঁচ ভাগ জৈব পদার্থ থাকতে হয়। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও বায়ু চলাচল বাড়াতে ওই পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকতে হলেও আমাদের দেশের মাটিতে রয়েছে ১ দশিমক ৮০ থেকে ২ ভাগ। কোন অঞ্চলে আরও কম। এতে করে জমিতে চাষীরা পর্যাপ্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহারে নির্ভশীল হয়ে পড়ছে। ফলে বিভিন্ন ফসলের উপর রোগ ও পোকামাকড়লের আক্রমণ বৃদ্ধিসহ ফসলের ফলন কমে যাচ্ছে। সেহেতু জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়াতে ভার্মি কম্পোস্ট এর ভূমিকা অপরিসীম। এটি বিবেচনা করে দুর্গাপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা অফিসার ড. বিমল কুমার প্রামানিকের পরামর্শে এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোখলেছুর রহমানের সহযোগিতায় ভার্মি কম্পোস্ট তৈরীর কাজ হাতে দেন বহরমপুর আইপিএম ক্লাবের সদস্যরা।

এটি করতে প্রথমে কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠনগুলোকে একত্রিত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর সম্প্রতি ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরীর কাজ শুরু করেন বহরমপুর আইপিএম ক্লাবের সদস্যরা। যার নাম দেওয়া হয় 'সয়েল হেলথ ভার্মি কম্পোস্ট ফার্ম' পরিদর্শন করি।

সরেজমিন ঘুরে দেকা গেছে, বহরমপুর গ্রামের একটি আম বাগানের পাশে এই ফার্মটি তৈরী করা হয়। এখানে ওপরে টিনের ছাউনি আর নিচে বেড়া দিয়ে দিয়ে তৈরী করা একটি ঘরের মধ্যে পাশাপাশি চারটি লাইনে ২৫০ টি মাটির চাড়ি বসানো হয়েছে। প্রতি মাটির চাড়িতে ১৫ কেজি গোবর সার ও ২০০ গ্রাম করে অস্ট্রেলিয়া জাতের কেঁচো দেওয়া আছে। কেঁচোগুলো গবর খেয়ে ফেলে। এরপর তারা যে মল পরিত্যাগ করে, সেগুলোই পরের ১৫ দিনের মধ্যে ভার্মি কম্পোস্ট সারে পরিণত হয়।

জানতে চাইলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোখলেছুর রহমান বলেন, ভার্মি কম্পোস্ট সার প্রতি শতক পাঁচ কেজি হারে প্রয়োগ করলে রাসায়নিক সার শতকরা ৫০ ভাগ প্রয়োগ করতে হবে। আর পর পর তিন বছর একই জমিতে বিভিন্ন ফসলে ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহার করার ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার আর প্রয়োজন হবে না। তখন শুধু ভার্মি কম্পোস্ট সার দিয়েই ফসল ফলানো সম্ভব হবে।
ওই ক্লাবের সভাপতি মাইনুল ইসলাম জানান, 'তাঁরা প্রথমে অস্ট্রেলিয়া জাতের ১৬ কেজি কেঁচো কিনে এনে এ সার উৎপাদন শুরু করেন। প্রতি কেজি কেঁচো ১ হাজার টাকা করে তারা কিনে আনেন। তবে বর্তমানে তাঁদের ফার্মে প্রায় ৫০ কেজি কেঁচো উৎপাদন হয়েছে। কারণ যে কেঁচো

মাটির চাড়িতে রাখা হয়, সেগুলো আবার বাচ্চা দেয়। এরপর যখন সারে পরিণত হয়, সেগুলো ছাকনা দিয়ে চেলে নিয়ে কেঁচোগুলোকে আলাদা করে নেওয়া হয়। আর সারগুলো হয়ে যায় আলাদা। এরপর সেই কেঁচোগুলো আবারো চাড়িতে ছেড়ে দেওয়া হয় গবরের মধ্যে। এভাবেই কেঁচো থেকে কেঁচো উৎপাদনের পাশাপাশি সারও উৎপাদন হচ্ছে। এতে করে দুইদিক থেকেই লাভ হচ্ছে।

মাইনুল ইসলাম আরো বলেন, ‘এই সার ক্লাবের সব সদস্যরা তাঁদের বিভিন্ন ফসলে এরই মধ্যে ব্যবহার শুরু করেছেন। পাশাপাশি গ্রামের অন্য কৃষকরাও কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে সারের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সেইসঙ্গে রাসায়নিক সার ব্যবহারও কমিয়ে দিয়েছেন। আশা করা যায় আগামী ৫ বছরের মধ্যে বহরমপুর ছাড়িয়ে উপজেলার অন্তত ৭৫ ভাগ কৃষক ভার্মি কম্পোস্ট সার ব্যবহার করতে শিখবে। আর এটি শুরু হলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমের দিক থেকে দুর্গাপুরই হবে দেশের একটি মডেল উপজেলা। সেই সঙ্গে পরিবেশ দূষনমুক্ত হবে ও প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা রাসায়নিক সার কেনা থেকে কৃষকরা রেহায় পাবেন।

দুর্গাপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসরাণ কর্মকর্তা ড. বিমল কুমার প্রামানিক বলেন, ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরী ও বিক্রি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে দুর্গাপুরে। এটি তৈরী করেই বছরে লাখ লাখ টাকা আয় করতে পারবে কৃষকরা। আবার ফসলে রাসায়নিক সারের ব্যবহারও কমে যাবে কয়েকগুন। একসময় হয়তো এ উপজেলায় আর রাসায়নিক সারের প্রয়োজনই হবে না। যদি কৃষকদের মাঝে এটি সঠিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দুর্গাপুরে শুধু ভার্মি কম্পোস্ট সার ব্যবহার করেই

সব ধরনের ফসল আমরা উৎপাদন করতে পারবো বলে আশা করছি।’

ভার্মি কম্পোস্ট

সাধারণ তথ্য

ভুমিকা

উদ্ভিদ ও প্রানীজ বিভিন্ন প্রকার জৈব বস্তুকে কিছু বিশেষ প্রজাতির কেঁচোর সাহায্যে কম সময়ে জমিতে প্রয়োগের উপযোগী উন্নত মানের জৈব সারে রুপান্তর করাকে ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচো সার বলে। ভার্মি-কম্পোস্ট বা কেঁচোসার নিয়ে কাজ করেছে বহুদিন থেকেই বিভিন্ন গবেষনা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা। আবার অনেক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ব্র্যাক, কারিতাসসহ অনেক এনজিও ভার্মি-কম্পোস্ট তৈরিসহ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করে বাজারজাতও করছে। কিন্তু ভার্মি-কম্পোস্ট এখনো এদেশের কৃষকের কাছে সুপরিচিত নয়।

কোঁচোর ইতিহাস

কেঁচো কতদিন আগে পৃথিবীতে আর্বিভাব হয়েছিল, তার সঠিক তত্ত্ব নেই, কারণ কেঁচোর শরীর খুব নরম এবং সহজেই পচে যায়। তাই জীবাশ্ব সৃষ্টি হওয়া কঠিন। এর বিবর্তনীয় অবস্থান পতঙ্গের নীচে। কেঁচোর আর্বিভাব সম্পর্কে দুটি উল্লেখযোগ্য ধারণা বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ সমাদৃত। বিজ্ঞানী জে. স্টিফেনসনের (১৯৩০) মতে “কেঁচো আজ থেকে প্রায় ১২ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে আর্বিভাব হয়েছিল”। অর্থাৎ দ্বিবীজপত্র গাছ (dicotyledonous) আর্বিভাব হওয়ার পরে। অন্য একদল বিজ্ঞানী আরো পূর্বে (প্রায় ৫৭ কোটি বছর) আবির্ভাবের কথা বলেন।

কেঁচোর প্রজাতি

সারা বিশ্বে ৪,২০০-এর বেশি প্রজাতির কেঁচো আছে। তার মধ্যে আমাদের দেশে ৫০০-র কিছু বেশি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। যেসব

স্থানে দেখা যায় না, তা হল-সমুদ্র, মরুভুমি, সর্বদা বরফাবৃত স্থান এবং যেখানে কোন রকম গাছপালা নেই। অবস্থান অনুসারে কেঁচোকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১) পেরিগ্রাইন (Perigrine): যারা সব রকম পরিবেশ মানিয়ে নিতে পারে এবং সর্বত্র বিরাজ করে।

২) এনডেমিক (Endemic): যারা কিছু নির্দিষ্ট স্থানে বর্তমান। এরা সব রকম পরিবেশ মানিয়ে নিতে পারে না।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ চারটি প্রজাতির কেঁচো, সার তৈরীর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন-(১) আইসেনিয়া, (২) ইউড্রিলাস, (৩) ফেরেটিমা এবং (৪) পেরিওনিক্স। আইসেনিয়া ফিটিডা (Eisenia foetida) নামক কেঁচোটি মূলতঃ এসেছে জার্মানি থেকে। সম্ভবত সারা বিশ্বে এই প্রজাতির কেঁচোটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে সর্বত্র এটি পাওয়া যায়। বিভিন্ন তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় বেঁচে থাকতে পারে। এরা দ্রুত বাড়ে। গড় আয়ু ৭০ দিন। অতি সহজেই এই প্রজাতির কেঁচো উৎপাদন করা যায়। কিছু প্রজাতির কেঁচো আছে, যারা মাটির উপরের স্তরে (২০-৩০ সেমি) থাকতে ভালবাসে, তাদের এপিগি (epige) বলে। মাটির গভীরে (৩০ সেমি) থাকে, তাদের এন্ডোগি (endoge) বলে। মাটির উপরের দিকে বসবাসকারী কেঁচো সার তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। ইউড্রিলাস ইউজেনি (Eudrilus Eugenie) প্রজাতির কেঁচোর আবির্ভাব ঘটেছে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে। দক্ষিণ ভারতের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে এদের পাওয়া যায়। গায়ের রং তামাটে, লাল ও গাঢ় বেগুনী রঙের হয়। এই কেঁচোও দ্রুত বাড়ে এবং সার তৈরীর ক্ষেত্রে উপযোগী। কেঁচোর গড় দৈর্ঘ্য ৩২-১৪০ মিমি, ব্যাস ৫-৮ মিমি, শরীর ১৪৫-১৯৬টি খন্ডে বিভক্ত। গড়ে প্রতিদিন ১২ গ্রাম জৈব বস্তু গ্রহন করে। প্রায় ৪০ দিনে পূর্নতা লাভ এবং পুর্ণতায় আসার সাতদিন পর প্রতিদিন ১টি করে ডিম থেকে

১৬-১৭ দিন পর বাচ্চা কেঁচো (১-৩ টি) জন্ম নেয়। ঠান্ডা ও গরম সহ্য করতে পারে এবং প্রায় ১-৩ বছর বাঁচে।
পেরিওনি এ কাভেটাস (Preionyx excavatus) কেঁচোর আদি নিবাস হল অস্ট্রেলিয়া। এই কেঁচোর পিঠের উপর সামনের অংশের রং ঘন বেগুনী থেকে লালচে-বাদামী এবং নীচের অংশ হালকা রঙের হয়। দৈর্ঘ্য ২৩-১২০ মিমিঃ ব্যাস ২.৫ মিমিঃ। অধিক আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে। পচা পাতা, কাঠ এবং বহমান নদীতেও পাওয়া যায়। জীবনকাল গড় ৪৬ দিন। পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ২১-২২ দিনে এবং গুটি বা ডিম দিতে থাকে ২৪ দিন পর, প্রতিদিন ১ টি করে। গুটি প্রতি ১-৩ টি কেঁচো যাওয়া যায়।
আমাদের দেশের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্মিকম্পোষ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা চলছে এবং উন্নত মানের ভার্মিকম্পোট তৈরী করতে ইউড্রিলাস ইউজেনি এবং আইসেনিয়া ফিটিডা-কে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়। পশ্চিমা দেশ গুলিতে আবার ইউড্রিলাস ফিটিডার ব্যবহার বেশি। ইউড্রিলাস ইউজেনি কেঁচোর সহনশীলতা বেশি। বিভিন্ন জৈব কীটনাশক যেমন-নিম খোল, মহুয়া খোল, গ্লাইরিসিডিয়া, ইউপাটোরিয়াম ইত্যাদির প্রতি অনেক বেশি সহনশীলতা দেখায়।

কেঁচোর গুরুত্ব

বিজ্ঞানী চালর্স ডারউইন সর্বপ্রথম কেঁচোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সকলকে অবগত করান। তিনি বলেন ‘‘কেঁচো ভুমির অন্ত্র এবং পৃথিবীর বুকে উর্বর মাটি তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রধান ভুমিকা পালন করে, যার উপর আমরা আমাদের ফসল উৎপাদন করি”। এই অতি সাধারন, ক্ষুদ্র প্রানীটি পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে সোনা ফলাতে পারে, কেঁচোসার বা ভার্মিকম্পোস্টে রুপান্তরিত করে। কেঁচোর উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ গুলি হল-মাটির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে খনন, চলন, আহার এবং পাচ্য

পদার্থ মল রুপে নিষ্কাশন। এইসব কার্যকলাপ নির্ভর করে মাটির অম্লতা (pH), জৈব পদার্থের পরিমান, পানি, তাপমাত্রা ইত্যাদির উপর। ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির (species) কেঁচোর কার্যকলাপ বিভিন্ন। সুতরাং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সব ধরণের কেঁচো একই রকম ভূমিকা পালন করে না। খনন ও চলন ক্রিয়ার মাধ্যমে মাটি কর্ষণ করতে পারে, অপর দিকে কেঁচো ৩ মিটার পর্যন্ত কর্ষণ করে, গাছ পালার কোনরকম ক্ষতি সাধন না করে। ফলে মাটিতে ছিদ্রের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, মাটির গহবরে পানি প্রবেশ করতে সাহায্য করে। মাটির তলায় (subsoil) পানির মাত্রা বৃদ্ধি পায়, মাটির ভিতরে তাপমাত্রার স্থিতিশীলতা এবং বায়ু চলাচল বৃদ্ধি পায়। কেঁচো, মাটি ও জৈব পদার্থ খেয়ে থাকে। আহার প্রক্রিয়া চলাকালীন অনবরত শরীরকে আর্দ্র রাখে। ফলে সর্বদা অতি সামান্য মাত্রায় হলেও মাটির আর্দ্রতা বাড়ায়। সেই সাথে ইউরিয়ার (urea) পরিমান বৃদ্ধি পায়। কেঁচো তার পোষ্টিক তন্ত্রের সাহায্যে মাটির কনাকে ভেঙ্গে দেয় এবং মাটির ভেতরে অবস্থিত গাছের খাদ্য উৎপাদন গুলিকে সহজ লভ্য করে তোলে। মাটি কণা ছোট হওয়ার ফলে আয়তন বেড়ে যায় মাটির পানিধারণ ক্ষমতা ও বায়ু চলন মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কেঁচোর উপস্থিতিতে মাটিতে বায়ু চলাচল ক্ষমতা ৮-৬৭% বৃদ্ধি পেতে পারে।

আহার পর্বের পর যে পাচ্য পদার্থ মলরুপে নির্গমণ হয় তাকে কাস্ট (cast) বলে। এই কাস্টের ভিতর জীবাণু সংখ্যা এবং তার কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে মাটির উর্বরতা বাড়ে। দেখা গেছে, পারিপার্শ্বিক মাটির তুলনায় কাস্টের মধ্যে জীবাণু সংখ্যা প্রায় হাজার গুণ বেশি। এই কাস্টের উপরে বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক উৎপাদনকারী ব্যাক্টেরিয়া জীবাণু বেশি থাকায় মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। যেমনঃ কাস্টের কারণে মাটি থেকে গাছে ৬ শতাংশ নাইট্রোজেন এবং ১৫-৩০ শতাংশ ফসফরাস হতে দেখা গেছে। এছাড়াও অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্য উপাদান যেমনঃ

ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি, গাছে বেশি পরিমাণে উপলব্ধ হয়। কেঁচোর উপস্থিতিতে জৈব পদার্থের কার্বন ও নাইট্রোজেন অনুপাত (C:N ratio) প্রায় ২০:১ এর কাছাকাছি হয়। এই অনুপাতে গাছ সহজেই কম্পোস্ট থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

ভার্মিকম্পোস্ট প্রস্তুত প্রণালী

কেঁচোর বৈশিষ্ট্য

কেঁচোর সার তৈরি করতে নির্দিষ্ট প্রজাতির কেঁচো বেছে নেওয়ার জন্য তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে নেওয়া আবশ্যক। যেমনঃ

১) শীত ও গ্রীষ্ম উভয় আবহাওয়াতে বেঁচে থাকার ক্ষমতা।

২) সব রকম জৈব বস্তু থেকে খাবার গ্রহণ করার সামর্থ্য।

৩) কেঁচো যেন রাক্ষুসে প্রকৃতির হয়, অর্থাৎ প্রচুর আহার করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

৪) অন্যান্য প্রজাতির কেঁচোর সাথে মিলেমিশে বাস করা।

৫) জৈব দ্রব্য পাওয়ার সাথে সাথে বা অল্প সময়ের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠা এবং সেখান থেকে খাবার সংগ্রহ করা।

৬) রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এবং প্রতিকুল অবস্থানে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়া।

৭) দ্রুততার সাথে বংশ বিস্তার করা এবং শারীরিক বৃদ্ধি ঘটানো।

উপকরণ

যে সব দ্রব্যকে কেঁচো সারে পরিণত করা যায় তা হলঃ (১) প্রাণীর মল-গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, ছাগল-ভেড়ার মল ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে গোবর উৎকৃষ্ট; মুরগীর বিষ্ঠায় প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ফসফেট থাকে যা পরিমাণে বেশি হলে কেঁচোর ক্ষতি হতে পারে। তাই খড়, মাটি বা গোবরের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা ভাল। (২) কৃষিক বর্জ্য-ফসল কাটার পর পড়ে থাকা ফসলের দেহাংশ যেমন-ধান ও গমের খড়, মুগ, কলাই, সরষেও গমের খোসা, তুষ, কান্ড, ভুষি, সব্জির খোসা, লতাপাতা,

আখের ছোবড়ে ইত্যাদি। (৩) গোবর গ্যাসের পড়ে থাকা তলানি বা স্লারী (Slurry)। (৪) শহরের আবর্জনা এবং (৫) শিল্পজাত বর্জ্য যেমনঃ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা বর্জ্য। যে সব বস্তু ব্যবহার করা উচিত নয়, তা হলঃ পেঁয়াজের খোসা, শুকনো পাতা, লংকা, মসলা এবং অম্ল সৃষ্টিকারী বর্জ্য যেমনঃ টমেটো, তেঁতুল, লেবু , কাঁচা বা রান্না করা মাছ মাংসের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি। এছাড়া অজৈব পদার্থ যেমনঃ পাথর, ইটের টুকরা, বালি, পলিথিন ইত্যাদি।

স্থান নির্বাচন

সার তৈরী করতে প্রথমে ছায়াযুক্ত উঁচু জায়গা বাছতে হবে, যেখানে সরাসরি সূর্যালোক পড়বে না এবং বাতাস চলাচল করে। উপরে একটি ছাউনি দিতে হবে। মাটির পাত্র, কাঠের বাক্র, সিমেন্টের পাত্র, পাকা চৌবাচ্চা বা মাটির উপরের কেঁচো সার প্রস্তুত করা যায়। লম্বা ও চওড়ায় যাই হোকনা কেন উচ্চতা ১-১.৫ ফুট হতে হবে। পাত্রের তলদেশে ছিদ্র থাকতে হবে যাতে কোনভাবেই পাত্রের মধ্যে জল না জমে। একটি ৫´ ৬” ও ৩´ ২” চৌবাচ্চা তৈরী করে নিতে পারলে ভাল হয়।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে চৌবাচ্চা বা পাত্রের তলদেশে ৩ ইঞ্চি বা ৭.৫ সেমি ইঁটের টুকরা, পাথরের কুচি ইত্যাদি দিতে হবে। তার উপরে ১ ইঞ্চি বালির আস্তরণ দেওয়া হয় যাতে পানি জমতে না পারে। বালির উপর গোটা খড় বা সহজে পচবে এরকম জৈব বস্তু বিছিয়ে বিছানার মত তৈরি করতে হয়। এর পর আংশিক পঁচা জৈব দ্রব্য (খাবার) ছায়াতে ছড়িয়ে ঠান্ডা করে বিছানার উপর বিছিয়ে দিতে হবে। খাবারে পানির পরিমাণ কম থাকলে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে যেন ৫০-৬০ শতাংশ পানি থাকে। খাবারের উপরে প্রাপ্ত বয়স্ক কেঁচো গড়ে কেজি প্রতি ১০ টি করে ছেড়ে দিতে হবে। কেঁচোগুলি অল্প কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর এক মিনিটের মধ্যেই

খাবারের ভেতরে চলে যাবে। এরপর ভেজা চটের বস্তা দিয়ে জৈব দ্রব্য পুরাপুরি ঢেকে দেওয়া উচিত। বস্তার পরিবর্তে নারকেল পাতা ইত্যাদি দিয়েও ঢাকা যেতে পারে। মাঝে মাঝে হালকা পানির ছিটা দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে অতিরিক্ত পানি যেন না দেওয়া হয়। এভাবে ২ মাস রেখে দেওয়ার পর (কম্পোস্ট) সার তৈরি হয়ে যাবে। জৈব বস্তুর উপরের স্তরে কালচে বাদামী রঙের, চায়ের মত দানা ছড়িয়ে থাকতে দেখলে ধরে নেওয়া হয় সার তৈরি হয়ে গেছে। এই সময়ে কোন রকম দুর্গন্ধ থাকে না।

কম্পোস্ট তৈরি করার পাত্রে খাবার দেওয়ার আগে জৈব বস্তু, গোবর, মাটি ও খামারজাত সার (FYM) নির্দিষ্ট অনুপাত (৬ : ৩ : ০.৫ : ০.৫) অর্থাৎ জৈব আবর্জনা ৬ ভাগ, কাঁচা গোবর ৩ ভাগ, মাটি ১/২ ভাগ এবং খামার জাত সার (FYM) ১/২ ভাগ, মিশিয়ে আংশিক পচনের জন্য স্তুপাকারে ১৫-২০ দিন রেখে দিতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর ঐ মিশ্রিত পদার্থকে কেঁচোর খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে, একটি ১ মিটার লম্বা, ১ মিটার চওড়া ও ৩ সেমি গভীর আয়তনের গর্তের জন্য ৪০ কিলোগ্রাম খাবারের প্রয়োজন হয়। এরকম একটি গর্তে এক হাজার কেঁচো প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথম দিকে কম্পোস্ট হতে সময় বেশি লাগে (৬০-৭০ দিন)। পরে মাত্র ৪০ দিনেই সম্পন্ন হয়। কারণ ব্যাক্টেরিয়া ও কেঁচো উভয়েরই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। তথ্য অনুসারে ১ কেজি বা ১০০০ টি কেঁচো, ৬০-৭০ দিনে ১০ কেজি কাস্ট তৈরি করতে পারে। এক কিলোগ্রাম কেঁচো দিনে খাবার হিসাবে ৫ কিলোগ্রাম সবুজসার (& Green leaf manure) খেতে পারে। তার জন্য ৪০-৫০ শতাংশ আর্দ্রতার বজায় রাখা আবশ্যক। প্রায় ৮০০-১০০০ কেঁচোর ওজন হয় ১ কিলোগ্রাম। এই পরিমাণ কেঁচো সপ্তাহে ২০০০-৫০০০ টি ডিম বা গুটি (Cocoon) দেয়। পূর্ণাঙ্গ কেঁচোর জন্ম হয় ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে।

সমস্যা ও সমাধান

কেঁচো সার তৈরি করতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা নিম্নে দেওয়া হলঃ

সমস্যা কারণ সমাধান

দুর্গন্ধ ও মাছি এবং পোকার আবির্ভাব ক) বিছানা অতিরিক্ত ভেজা।

খ) কেঁচোর খাবার সরাসরি বায়ুমন্ডের সংস্পর্শে আসা।

গ) তৈলাক্ত বা অপছন্দের খাবার।

ঘ) পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল না করা।

ঙ) অতিরিক্ত খাবার দেওয়া। ক) বিছানা থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, বিছানাকে কিছু দিয়ে আলগা করা।

খ) খাবার ঢেকে দেওয়া ।

গ) অপ্রয়োজনীয় খাবার সরিয়ে দেওয়া।

ঘ) কিছু দিন খাবার দেওয়া বন্ধ রাখা।

কেঁচো মরে যাওয়া ক) অত্যাধিক শুকনো বা ভেজা খাবারের অভাব।

খ) বিছানার আস্তরণ শেষ হয়ে যাওয়া।

গ) বেশি ঠান্ডা বা গরম।

ঘ) বিষাক্ততা। ক) সহনশীল স্থানে কম্পোস্টের জায়গা বদল করা।

খ) খাবার ও বিছানার বস্তুগুলি ভালভাবে দেখে নেওয়া যেন ক্ষতিকারক কোন বস্তু না থাকে।

ছত্রাক ক) অম্লতা সৃষ্টি। ক) লেবুর খোসা, তেঁতুল ইত্যাদি অম্লতা সৃষ্টিকারী বস্তু সরিয়ে ফেলা।

নীচ দিয়ে পানি গড়িয়ে যাওয়া ক) অতিরিক্ত পানি ব্যবহার। ক) অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়া। বিছানা করার জৈব বস্তু মিশিয়ে দেওয়া, দু-এক দিন উপরের ঢাকনা সরিয়ে রাখা।

কেঁচো পালিয়ে যাওয়া ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। ক) উপরের কারণগুলি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা ও প্রতিকার নেওয়া।

কোঁচো সার উৎপাদনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব
কেঁচোসার উৎপাদন ও বিক্রয়ের একটি আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হলঃ
ব্যয়
বিষয়/বস্তু পরিমাণ মূল্যহার মোট মূল্য
প্রথম বছর
১) চৌবাচ্চ নির্মাণ (৫´ x ৩´ x ১.৫´) ৪ ২০০০.০০ ৮০০০.০০
২) ছাউনী ১ ১০০০.০০ ১০০০.০০
৩) কেঁচো সংগ্রহ ৪০০ ২৫০.০০/হাজার ১০০০.০০
৪) গোবর ও আবর্জনা সংগ্রহ ৮ টন ৫০০.০০/টন ৪০০০.০০
মোট ১৪০০০.০০
দ্বিতীয় বছর
১) গোবর ও আবর্জনা সংগ্রহ ১২ টন ৫০০.০০/টন ৬০০০.০০
মোট ৬০০০.০০

ভার্মি কম্পোস্টকে মাটির প্রাণ বলা হয়। এই মাটির প্রাণ তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছেন পবা উপজেলার বড়গাছি ইউনিয়ন পরিষদের মাধবপুর গ্রামের নারীরা। কিভাবে এবং কেন ভার্মি কম্পোস্ট তৈরিতে উৎসাহিত হলেন জানতে চাইলে পূর্বাশা নারী সংগঠনের সভাপতি মোসাঃ মনিরা বেগম বলেন, “আমি একদিন বড়গাছি ইউনিয়ন পরিষদের এক সভাতে গেছিলাম সেখানে জানতে পারি কেঁচো কম্পোস্ট বা ভার্মি কম্পোস্ট এর ব্যবহার ও উপকারিতার কথা। জানতে পেরেছিলাম কোথায় কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি হয়।” কেঁচো কম্পোস্ট সম্পর্কে ধারণা লাভ করার পর তিনি নিজে এই সার তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। তিনি খোঁজ নেন কোথায় এই ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি হয়, কীভাবে তৈরি হয়। এভাবে এক পর্যায়ে তিনি জানতে পারেন বাংলাদেশে সবচে’ বড় কেঁচো কম্পোস্ট খামার তৈরি হয়

মোহনপুর থানার মহিষকুন্ডি গ্রামে। এই খামার পরিচালনা করেন কৃষক মো. শাহ আলম। এই কৃষক শুরুতে ৪০টি চাড়ি দিয়ে কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি করলেও বর্তমানে তিনিদু'টি কেঁচো কম্পোস্টের খামারের মালিক। এই দু'টি খামারে কেঁচো কম্পোস্টের চাড়ির সংখ্যা ৮০০টি।

মোসাঃ মনিরা বেগম এবং মোসাঃ রেনুকা বেগম দু'জন মিলে মো. শাহ আলমের বাড়িতে সেই কেঁচো কম্পোস্ট দেখতে যান এবং মো. শাহ আলমের কাছ থেকে কেঁচো কম্পোস্ট তৈরির কৌশল ও উপকরণ জেনে নেন। তাঁরা দু'জন মিলে মোঃ শাহ আলমের কাছ থেকে ৪০০০ হাজার টাকার কেঁচো ক্রয় করেন। তাঁরা দু'জন মিলে গত মে ২০১৬ মাস থেকে কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি করতে শুরু করেন। বর্তমানে তাদের কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি করা দেখে অনেক কৃষক তাদের অনুসরণ করছেন। ইতিমধ্যে মোসাঃ মনিরা বেগম কেঁচো বিক্রি করতে শুরু করেছেন তাদের কাছে। অন্যদিকে মোসাঃ রেনুকা বেগম ১২ জন নারীর কাছে ৬০০০ হাজার টাকার কেঁচো বিক্রি করেছেন বলে জানান।

কেন তাঁরা কেচো কম্পোস্ট তৈরিতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন জানতে চাইলে মোসাঃ মনিরা বেগম বলেন, "এই সার ব্যবহারে মাটি সুস্থ থাকে এবং উৎপাদিত শস্য-ফসলও বিষমুক্ত হয়।" তিনি বলেন, "রাসায়নিক সার দেওয়ার কারণে আমাদের এলাকার সকল মানুষই প্রতিনিয়ত কোন না কোনভাবে বিষ খাচ্ছেন। যার ফলে আমরা নানান রোগে আক্রান্ত হয়েছি। তাই নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করার জন্যই আমরা কেঁচো সার তৈরি করে

ফসলের জমিতে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিই।” মোসাঃ মনিরা বেগম ও মোসাঃ রেনুকা বেগম তাদের বাড়ির আশেপাশের ক্ষেতে কেঁচো সার ব্যবহার করেন। তাদের উদ্দেশ্য নিজে ও মানুষকে বিষমুক্ত খাদ্য যোগান দেওয়া।

মোসাঃ মনিরা বেগমদের এই উদ্যোগ এলাকার অন্যান্য কৃষাণ ও কৃষাণীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কেঁচো সারের উপকারিতার কথা জেনে রাজশাহীর বড় গাছি ইউনিয়নের বিভিন্ন পাড়ার কৃষাণীরা কেঁচো কম্পোস্ট তৈরিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে মোসাঃ মনিরা বেগম যেহেতু একটি সংগঠনের সাথে জড়িত সেহেতু তিনি সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের মাঝেও কেঁচো কম্পোস্ট এর উপকারিতা ও কার্যকারিতার বিষয়টি সহভাগিতা করেন। ফলশ্রুতিতে সংগঠনের ২৫ জন সদস্যকে এই কেঁচো কম্পোস্ট তৈরিতে আগ্রহী হয়েছেন। মোসাঃ মনিরা বেগম ইতিমধ্যে তাদেরকে কেঁচো কিনতে কিনতে সহযোগিতা করেছেন বলে জানান। এছাড়া তিনি তাদেরকে কেঁচো কম্পোস্ট তৈরির কৌশলগুলোও শিখিয়ে দেন বলে তিনি জানান। বর্তমানে বড় গাছি ইউনিয়নে মোট ৫৩ জন নারী কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি করছেন। এই সার তারা লাউ, কুমড়া শিম পুইঁ,এবং কিছু পরিমাণে ধানের জমিতে ব্যবহার করছেন। ইতিমধ্যেই বড়গাছি ইউনিয়নে আরও ১০জন কেঁচো কম্পোস্ট তৈরিতে আগ্রহী ব্যক্তির নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে হয়েছে বলে মোসাঃ মনিরা বেগম জানান। এই প্রসঙ্গে মোসাঃ মনিরা বেগম বলেন, “এমন এক সময় আসবে যখন দেখা যাবে আমাদের ইউনিয়নের ৮০% কৃষক এই কেঁেচো সার ব্যবহার করে ফসল ফলাচ্ছেন।”

happy wheels 2